বাংলাভাষা, সংস্কৃতি, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং রামেন্দ্রসুন্দর

এম.কে.আনাম

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একজন প্রকৃত দেশপ্রেমী ও জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। কিন্তু তিনি ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিশেষভাবে বাংলাভাষা চর্চার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন, তার সঠিক মূল্যায়ন যদি আমরা করি — তা হলে আমরা দেখব, তাঁর মতো খুব কম মনীষীই ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর কাছে দেশপ্রেম এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মানবতাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। তিনি কবিগুরুর মতোই অখণ্ড ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন। আশুতোষ বাজপেয়ী সম্পূর্ণ সঙ্গতভাবে লিখেছেন যে, রামেন্দ্রসুন্দর 'মাটির মানুষ' ছিলেন।[১] তিনি বাংলার একজন প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী এবং মনীষী ছিলেন। কিন্তু কোনোদিনের জন্য তিনি নিজের জন্মভূমি জেমো-কান্দি এবং মুর্শিদাবাদ জেলাকে ভুলেননি। তাঁর দেশপ্রেম জাতীয়তাবাদ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে শুরু হয়ে সমগ্র জেলা, রাজ্য এবং সমগ্র দেশব্যাপী পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রকৃত অর্থে তিনি একজন স্বদেশী ছিলেন।

বাংলার ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য এবং জাতীয়তাবাদী বিকাশের ধারাকে স্তব্ধ করার জন্য শাসনতান্ত্রিক সুবিধার অজুহাতে ১৯০৫ সালে ইংরেজ গভর্নর জেনারেল কার্জন বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকর করেন। এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সারা দেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। স্বদেশী পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, স্বদেশী শিক্ষাকেন্দ্র, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা এবং বিলাতি পণ্যদ্রব্য, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বর্জন করার জন্য এক ব্যাপক স্বদেশী ও বয়কট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই ব্যাপক আন্দোলনে যে সব নেতৃবৃন্দ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তদানিন্তন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অন্যতম ছিলেন। তিনি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে, বিশেষ করে মহিলাদের সামিল করে, এই আন্দোলনকে এক গণ আন্দোলনে পরিণত করেন। তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে সারা দেশে অরন্ধন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।[২]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিবাদের জেমো-কান্দিতে বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশী আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে জেমো এবং কান্দি শহরের সব রাস্তায় রাস্তায় বিশাল প্রতিবাদ মিছিল পরিক্রমা করে। ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিনে জেমো এবং কান্দির মানুষ সব দোকানপাট বন্ধ করে হরতাল পালন করে।[৩] ১লা নভেম্বর স্থানীয় নদীর তীরে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান অসংখ্য মানুষ যোগদান করেন।[৪] স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সময় কান্দিতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' নামক এক দেশাত্মবোধক পুস্তিকা রচনা। বঙ্গভঙ্গের প্রতিকারের জন্য হিন্দু মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য এই ব্রতকথা পাঠ করে বঙ্গের নারীগণ প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প গ্রহণ করে।[৫] ১৩১২ বঙ্গাব্দের (১৯০৫ খ্রি.) পৌষ মাসে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' প্রথম প্রকাশিত হয়।[৬] রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পাঠ করে সারা বাংলায় এই

আন্দোলনের সূচনা করেন।[৭] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' সমগ্র বাংলার জনসাধারণকে, বিশেষ করে মহিলাদেরকে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় রাখার এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানায়। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে, বিশেষ করে বিপ্লবী আন্দোলনে দেশবাসীকে প্রেরণা জোগায়।[৮]

বাংলায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ও পুলিশ পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তৃপক্ষ এক রিপোর্টে লিখেছেন, 'রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুলিশ কমিশনারের কাছে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি এই পুস্তকের আর কোনও প্রকাশনা করবেন না এবং পুস্তিকাটির যে কপিগুলি তখনও বিক্রি হয়নি, সেগুলি প্রকাশকের নিকট থেকে নিয়ে পুলিশ কমিশনারের কাছে জমা দিবেন।'[৯] পরবর্তী রিপোর্টে পুলিশ কমিশনার লিখেছেন, 'আমার পূর্ববর্তী রিপোর্ট অনুযায়ী বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুলিশ কমিশনারের নিকট তাঁর পুস্তকের (বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা) ১৯৬১-খানা কপি জমা দিয়েছেন।'[১০] আলোচ্য পুস্তকখানির প্রকাশ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও যে এটি স্বদেশী আন্দোলনের সম্প্রসারণে ও ভারতীয়দের মনে দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করতে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল, তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ঘটাতে এবং এগুলোর ছেদহীন বিকাশ ঘটাতে রামেন্দ্রসুন্দর আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠায় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন ও ব্যবস্থা করার মহান কাজে যে সব মনীষী আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সাহিত্য পরিষদে তাঁর ভূমিকার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে অভিনন্দন দিয়ে বলেছিলেন, 'সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে পরিচালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে জয় করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ।'[১১] স্বদেশী সাহিত্য এ সংস্কৃতির উন্নতি ঘটাবার এবং বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করে বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতিকে শক্তিশালী করার জন্য ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র কলকাতার টাউনহলে আয়োজিত সভায় পঠিত 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রস্তাব করেছিলেন জেলায় জেলায় সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হোক।'[১২]

রবীন্দ্রনাথের ওই প্রস্তাব অনুসারে সর্বপ্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং কাশিমবাজারের তদানীন্তন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১৭ই ও ১৮ই কার্তিক (১৯০৭ খ্রি.) প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১৩] প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অগ্রদূতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৩০৬ সালে এক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন, 'মুর্শিদাবাদ নিবাসী মহাজার মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রদত্ত ভূমির উপর নতুন মন্দির নির্মিত হইয়াছে, মুর্শিদাবাদ নিবাসী রায় শ্রীনাথ পাল গৃহতল মর্মর-মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পর্ক এইরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া

মুর্শিদাবাদ নিবাসী বর্তমান সম্পাদক যদি কিছু আনন্দ ও গর্ববোধ করেন, তাহা অবশ্যই মার্জনীয় হইবে।'[১৪]

যাই হোক, ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর ভাষণে সম্মুখস্থ শ্রোতৃবৃন্দ তথা বাংলার সমস্ত জনগণকে সাহিত্য পরিষদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান।[১৫] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে জনসাধারণের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী জাগরণ চলছে তার উল্লেখ করে সকলকে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির সেবা করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতি চর্চা করেন, তাঁহারা কংগ্রেস, কনফারেন্সে মিলিত হইতেছেন; যাঁহারা সনাতন ধর্মের অনুগত, তাঁহারা ধর্মমহামণ্ডলে সম্মিলিত হইতেছেন; যাঁহারা শিল্পের উন্নতি চান, তাঁহারা দল বাঁধিতেছেন; যাঁহারা শিক্ষার উন্নতি চান, তাঁহারাও দল বাঁধিতেছেন; আমরা সাহিত্যসেবীরাই কি চুপ করিয়া থাকিব? সকলের দেখাদেখি আমরাও জোট বাঁধিয়া এখানে আজ উপস্থিত হইয়াছি। সকলেইযদি হাওয়ার অনুকূলে গা ঢালিয়া দেন, আমরাই বসিয়া থাকিব কেন? আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলনকে যদি কেহ গড্ডলিকা প্রবাহের মত পরের অনুকরণজাত বলিয়া উপহাস করিতে চান, তাহাতে আমরা কর্ণপাত করিব না।'[১৬]

তিনি বাংলা ও বাঙালির প্রাচীন কাল থেকে কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নেই বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্য যা পাল ও সেন যুগে সমৃদ্ধি লাভ করে ও মধ্যযুগে সমৃদ্ধতর হয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত যার ধারা অব্যাহত, তা থেকেই শৌর্য-বীর্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাঙালির গৌরবময় ইতিহাস রচনা করা যে যায় তা তিনি দাবি করেছেন। তাঁরই ভাষায় — 'বাঙ্গলার পুরুষ পরম্পরাগত সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য রহিয়াছে। সেই সাহিত্য লইয়া আমরা ভাবের হাটে উপস্থিত হইব; সেখানে কেহ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিবে না। বাঙ্গলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু কি সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই? সে কালের বাঙ্গালী কীরূপে কাঁদিত, কীরূপে হাসিত, তাঁহার অন্তরের মর্মস্থলে কখন কোন্ স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীতে কয়টা জাতি এতদিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না। ...'[১৭]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এটা ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের প্রধান অন্তরায়। তিনি সবসময় চাইতেন হিন্দু-মুসলমানের উচিত তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা, কারণ উভয় সম্প্রদায়ের অনৈক্য ভারতকে দুর্বল করবে।[১৮] তিনি এটা জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্য ছাড়া এ দেশে জাতি গঠন হতে পারে না।[১৯] তিনি এটা দুঃখ করে বলেছেন যে, হিন্দুদের মূর্তিপূজা এবং মুসলমানদের গো-হত্যার কারণে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অহেতুক ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। কিন্তু তাঁর এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল — এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন যে, ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, অতীতে এই দুই

সম্প্রদায় সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করেছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম হিন্দুদের শাসন করেছে অন্যদিকে হিন্দু রাজা জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলমানদের শাসন করেছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই কোনো অসুবিধা হয়নি, হয়নি কোনও সাম্প্রদায়িক সমস্যা। তাঁর মতে, ব্রিটিশ শাসকরা এই উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধে জন্য অনেকটা দায়ী।[২০] তাঁর এম. ইসমাইল নামে এক ছাত্র অর্থাভাবে ইংল্যান্ডের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। সেই ছাত্র যখন তাঁর নিকট শরণাপন্ন হন তখন তিনি ইসমাইলকে অনতিবিলম্বে যথেষ্ট টাকা পয়সা পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা ভালোভাবে সমাপ্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন।[২১] আমরা যদি তাঁর জীবনী ও কার্যাবলি অধ্যয়ন করি তা হলে এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাব।

আশুতোষ বাজপেয়ী একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি লিখেছেন, "একদা রিপন কলেজ ছাত্রাবাসে ছাত্রদের মধ্যে একটা জাতিগত বিরোধের সৃষ্টি হয়। সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। সেই বিদ্বেষ ক্রমশ প্রবল আকার ধারণ করিয়া শেষে শত্রুতায় পরিণত হইল; ব্যাপার গুরুতর হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয় সকল বিবরণ প্রিন্সিপাল মহাশয়ের গোচরে আনিলেন। প্রিন্সিপাল মহাশয় উভয় দলের ছাত্রদের আহ্বান করিয়া তাহাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, পরে তাহাদের মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন এবং বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য একটা দিন স্থির করিয়া দিয়া বলিলেন, 'ইতিমধ্যেই সকল ছাত্রকেই শান্তভাবে দিনপাত করিতে হইবে, যদি কেহ কোনরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়া শান্তিভঙ্গের আয়োজন করে, তাহা হইলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।' বলা বাহুল্য, সেই কয়টা দিন তাঁহার আদেশমত ছাত্রগণ শান্তভাবেই কাটাইয়া দিল। নির্দিষ্ট দিনে প্রিন্সিপাল মহাশয় দলের অগ্রণীদিগকে আহ্বান করিলেন, এবং আগামী রবিবারে তাহাদের সহিত মেসে মধ্যাহ্নকালে একত্র বসিয়া আহার করিবেন — এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; ছাত্রগণ প্রিন্সিপাল মহাশয়ের প্রস্তাবে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল, এবং নানাবিধ আহার্যের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার বালক দৌহিত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন; তিনি সকলের মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করিলেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই দল ছাত্র উপবেশন করিল। দীর্ঘকাল ধরিয়ে যে সকল ছাত্র একত্রে আহার করিতে আপত্তি করিত, এক্ষণে তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে প্রিন্সিপাল মহাশয়ের পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। আহার করিতে করিতে প্রিন্সপাল মহাশয় তাহাদিগকে মিষ্ট বাক্যে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিলেন, 'আমরা হিন্দু যাহাদের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিব, তাহাদের সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য রাখিতে পারি না, পূর্বাচরণ বিস্মৃত হইয়া প্রাণ খুলিয়া বন্ধুভাবে তাহাদের বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিব। সাম্প্রদায়িক বিরোধ লইয়া হিন্দু সন্তও কখনও রক্তপাতে প্রবৃত্ত হয় নাই, হিন্দু গ্রামে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া নানা সম্প্রদায়ের লোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য রক্তপাতের কথা ইতিহাসে কোথাও দেখিতে পাইবে না, তোমরা হিন্দুর সন্তান তিতিক্ষাপরায়ণ হইতে অভ্যাস কর, হিন্দুর পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিও না; হিন্দু নামের গৌরব তোমরা রক্ষা করিতে পারিবে কি?' অতঃপর উভয় দলের ছাত্রগণ যুক্তকরে প্রিন্সিপালের নিকট তাহাদের লজ্জাজনক আচরণের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া সরল অন্তঃকরণে বলিল, 'আমরা আমাদের পূর্বকৃত আচরণের কথা স্মরণ করিয়া এক্ষণে লজ্জাবোধ করিতেছি,

আমাদের মনের মধ্যে কোনও গোলযোগ নাই।' ছাত্রদের মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া প্রিন্সিপাল মহায়শ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এত বড় বিবাদটা কয়েকটা কথাতেই নিষ্পত্তি হইয়া গেল। ছাত্রদের মনে ব্যথা দিয়া কঠোর হস্তে তাহাদের শাসন করিবার ব্যবস্থা তিনি সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার আচরণে ছাত্রগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যধিক ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল।"[২২]

উপরোক্ত ঘটনা থেকে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের কাছে একটা মৌলিক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। রামেন্দ্রসুন্দর শুধু একজন অধ্যক্ষ বা শিক্ষক হিসাবে নয়, তিনি একাধারে শিক্ষাসংস্কারক, বিজ্ঞানী, মানবতাবাদী, বাংলা সাহিত্যসাধক, দেশপ্রেমিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর প্রকৃতই একজন সুন্দর মানুষ ছিলেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজও এই মনীষীর সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। রামেন্দ্রসুন্দর রচিত গ্রন্থাবলি, তাঁর উপর রচিত বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ, বই, পুস্তক, গ্রন্থ ইত্যাদির ব্যাপকভাবে চর্চা হওয়া দরকার। এই চর্চা সব বয়সের সর্বস্তরের মানুষের মানবিক মূল্যবোধের যে উন্নতি ঘটাবে, তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।